দশম অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

জলপথ

আরো অনেক বিষয়ের মতো জেলার পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য পাওয়া যায় বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণীতে। তবে তাঁদের স্থলপথের বিবরণের চেয়ে জলপথের বিবরণই বেশী। সম্ভবত স্থলপথের তেমন বিকাশ ঘটেনি তখনও। নদীমাতৃক বাংলার তৎকালীন জেলাঞ্চলের প্রয়োজনের তাগিদেই নৌ-পরিবহণের বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। তবে সাধারণ মানুষ নেহাৎ ফেরী পারাপার বা কৃষির কাজে ছাড়া অন্য কাজে জলপথ ব্যবহার করত বলে মনে হয় না। কেননা সেকালে সাধারণ মানুষদের গ্রামের চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন হ'ত খুব কম। বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হত পাশাপাশি গ্রামের মধ্যেই। কাজেই পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যও তাদের লাগত না।

মুর্শিদাবাদের পথ ও পরিবহণ সম্পর্কে প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চম শতাব্দীতে। তখন কর্ণসুবর্ণের সন্নিহিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার থেকে বৌদ্ধ সংঘের আশীর্বাণী নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত। মালয় উপদ্বীপে তাঁর সেই ভ্রমণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে সেখানে উৎকীর্ণ এক স্মৃতিফলকে[১]। এক সময় কর্ণসুবর্ণ যে সমুদ্রগামী জাহাজের বন্দর ছিল তার প্রত্য(প্রমাণ এই ঘটনাটি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো মূলতঃ বণিক, রাজা, বাদশা বা নবাবদের প্রয়োজনেই জেলাঞ্চলের নৌশিল্প বিকশিত হয় এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে জেলাঞ্চলের প্রত্য(যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম থেকে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ (মতান্তরে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজা শশাঙ্ক পূর্বভারতের সার্বভৌম রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরের উপকণ্ঠে 'কর্ণসুবর্ণ'তে। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে তৎকালীন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণ তখন ছিল অন্যতম প্রধান নৌবন্দর। তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ এবং সমতট তখন ছিল বর্হিবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত ছিল পূর্ব ভারতের প্রধান আর্ন্তজাতিক বন্দর। ভাগীরথীর প্রবাহ ধরে কর্ণসুবর্ণ থেকে সমুদ্র যাত্রার পথ ছিল সুগম। জল ও স্থলপথের মাধ্যমে কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগ ছিল[২]। আর তাম্রলিপ্ত থেকে মূলত চারটি সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য সংগঠিত হ'ত। প্রথম পথটি তাম্রলিপ্ত থেকে দ(ণ-পূর্ব দিকে আরাকান হয়ে ব্রহ্মদেশ ও দ(ণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় পথটি বিস্তৃত ছিল তাম্রলিপ্ত সমুদ্রোপকূল থেকে চিলাকোল হয়ে দ(ণ-পূর্ব এশিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত। তৃতীয় পথটি বিস্তৃত ছিল তাম্রলিপ্ত থেকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এবং চতুর্থ সমুদ্র পথটি তাম্রলিপ্ত থেকে কলিঙ্গ করমণ্ডল হয়ে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল[৩]। তাম্রলিপ্তের সঙ্গে স্থলপথ এবং জলপথে কর্ণসুবর্ণের যোগাযোগ থাকায় কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে ঐ সমস্ত দেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রয়োজনের তাগিদেই নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে চলেছিল। রোমের প্রখ্যাত লেখক পি-নী জানাচ্ছেন যে প্রথম দিকে তাম্রলিপ্ত থেকে সমুদ্রপথে সিংহল যেতে সময় লাগত বিশ দিন, পরে তা কমে দাঁড়ায় সাত দিনে। জাহাজের গতিবেগ বাড়া এবং তার ফলে সময় কমে যাওয়া পরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশের ইঙ্গিতবাহী।

পরবর্তীকালে জেলাঞ্চলের কর্ণসুবর্ণ থেকে রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় নদী বন্দর হিসাবে কর্ণসুবর্ণের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠাও এই পতনকে ত্বরান্বিত করে[৪]। তবে বন্দর হিসাবে কর্ণসুবর্ণের গরিমা কমলেও পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা অটুট থাকে এবং ত্র(মশ তা বহুধাবিস্তৃত হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ভরকেন্দ্র গৌড়ে অবস্থানকালে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে নদীপথে গৌড়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয় যা জেলাঞ্চলের নৌশিল্প ও নৌপরিবহণ ব্যবস্থাকেও পুষ্ট করতে থাকে। বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তারকালেও এই প্রত্রি(য়া চলতে থাকে। বাংলায় বিদেশী বণিকদলের পদসঞ্চারে এই প্রত্রি(য়া আরো দ্রুততর হয়। মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অনুকূল পরিস্থিতিতে পর্তুগীজ বণিকদল নৌপথ ব্যবহার করে জেলাঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধি তরান্বিত করে। নদীপথে পরিবহণ ব্যবস্থা এর ফলে দ্রুত বিকশিত হয়।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহানের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা সরাসরি মোগলদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এর চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল ১৬৩২ সালে। ঐ বছর বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁ হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে হুগলীকে বাদশাহী বন্দর হিসাবে ঘোষণা করেন। এর ফলে চট্টগ্রাম থেকে সপ্তগ্রাম, হুগলী, হয়ে সুদূর পাটনা পর্যন্ত পর্তুগীজদের যে বাণিজ্যজাল বিস্তৃত ছিল তা ভেঙে পড়ে এবং বাংলার বাণিজ্যে তাদের গৌরব অস্তমিত হয়। এ ঘটনা 'শাপে বর' হয় মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের (ে ত্রে।

CHAPTER 9 A # 391
15-9-03

হুগলী বন্দর বাদশাহী বন্দর হিসাবে ঘোষিত হবার অব্যবহিত পর পরই কাশিমবাজার বেসরকারি নদীবন্দর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে[৫]। বাদশাহী বন্দরের শুল্ক এড়ানোর জন্য দেশী বিদেশী বণিকদল ভিড় করল কাশিমবাজারে। এর ফলশ্রুতিতে জেলাঞ্চলের সমৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্থার (ে ত্রেও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

কাশিমবাজার বন্দরের শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে বন্দরের পশ্চাদভূমির গ্রামগুলিকে বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত(করার প্রয়াসে স্থলপথও নির্মিত হতে থাকে। ১৭১৮ সালে কাশিমবাজারে তৈরী হ'ল পাকাপোক্ত(জাহাজ ঘাট। বন্যার জল যাতে জাহাজঘাটের (তি করতে না পারে সেজন্য দুপাশে চারশো ফুট লম্বা ভাল ইঁটের পাকা দেওয়াল তুলে - ষাট ফুট উচ্চতায় তৈরী হয়েছিল সেই জাহাজঘাট। সেইযুগে এই কাজের জন্য খরচ হয়েছিল তিনহাজার টাকা। যার মধ্যে মাত্র ২৫০ টাকা দেয় ইংরেজ কোম্পানী বাকী টাকা দেয় কাশিমবাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা[৬]।

সেই কালপর্বে কি বৃটিশ বণিক, কি পরিব্রাজক সকলেই নদীপথ ব্যবহার করে ব্যবসায়িক কাজকর্ম বা পরিভ্রমণ করেছেন। ১৬৬০-৬১ সালে নিকোলো মানুচী নদীপথে হুগলী থেকে কাশিমবাজার এসেছিলেন। যাত্রা শু(করার তৃতীয় দিনে তিনি কাশিমবাজার এসে পৌঁছেছিলেন[৭]। এখান থেকে তিনি নদীপথেই রাজমহল হয়ে আগ্রা যাত্রা করেছিলেন। তাঁরও আগে এসেছিলেন সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক (১৬২৯-৪৩)। তাঁর রচনাতেও বেগবান গঙ্গার তীরে অবস্থিত কর্মব্যস্ত কাশিমবাজারের বর্ণনা পাওয়া যায়। বার্ণিয়ের বা ট্যাভারনিয়ারও জেলাঞ্চলে এসেছিলেন নদীপথেই। বার্ণিয়ের নদীপথে সুতি পৌঁছে সেখান থেকে স্থলপথে কাশিমবাজার এসেছিলেন। ১৬৮৬ সালের এপ্রিল মাসে হেজেস বহরমপুরের অনতিদূরে মহুলা গ্রাম পর্যন্ত নদীপথে এসে সেখান থেকে স্থলপথে কাশিমবাজার আসেন। হলওয়েল বড় বজরায় কাশিমবাজারে আসার পথে নদীতে জলাভাবের দ(ণ অসুবিধায় পড়েন। পরে তিনি বজরা ছেড়ে ছোট নৌকায় করে কাশিমবাজারে পৌঁছান। এইসব বিবরণী থেকে এটা বোঝা কষ্টকর নয় যে নদীবন্দর হিসাবে কাশিমবাজারের আত্মপ্রকাশের পর ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও এই জলপথটির ব্যবহার ত্র(মশ বাড়তে থাকে। মূলত রেশম, তুলাজাত দ্রব্য, সোরা এবং সুলভ খাদ্যশস্য নদীপথে আমদানি রপ্তানী হ'ত। পাটনা থেকে আসত সোরা ভর্তি জাহাজ। কাশিমবাজারে সেই সোরা খালাস করে ছোট ছোট জাহাজগুলি ফিরে যেত পাটনায়। কাশিমবাজার থেকে বড় জাহাজ ভর্তি হয়ে সেসব যেত কলকাতা অভিমুখে।

কাশিমবাজার বন্দরের সুযোগ সুবিধা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছিল জাহাজ আসা যাওয়ার সংখ্যাও। নবাব আলীবর্দীর আমলে বর্গীর হাঙ্গামায় ক্লান্ত নবাব শূন্য রাজকোষ ভরাতে ১৭৪৪ সালে ইংরেজদের কাছে থেকে ত্রিশল(টাকা দাবী করলেন[৮]। তাঁর যুক্তি(আগে ইংরেজ কোম্পানীর চার পাঁচখানা জাহাজ কাশিমবাজার বন্দর দিয়ে আসা যাওয়া করত এখন ৪০-৫০ খানা জাহাজ আসা যাওয়া করে কাজেই নবাবের দাবী ন্যায্য। শেষ পর্যন্ত রফা হ'ল সাড়ে তিন ল(টাকায়।

ওই কালপর্বে কাশিমবাজার ছিল খুবই ব্যস্ত বন্দর। বর্গীর হাঙ্গামার সময় সন্ত্রস্ত বণিককুল পছন্দ করত ভাগীরথীর পথকেই। এমনকি ঢাকা থেকে আগত নৌকাসমূহও পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সুন্দরবন ঘুরে না এসে উজানে ফরাক্কা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ভাগীরথীর প্রবাহ ধরে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছত। তখন ভাগীরথীর নাব্যতাও ছিল কম। গ্রীষ্মকালে বড় জাহাজ তো দূরের কথা ছোট নৌকাও আটকে যায় চড়ায়। তবু নিরাপদ রাস্তা বলে বণিকদের ভীড় ছিল এ পথেই। শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল রীতিমত কড়া। প্রতিটি নৌকার জন্য আলাদা ছাড়পত্র দেওয়া হ'ত। সেই ছাড়পত্রের পোষাকী নাম ছিল 'রওয়ানা'। আলাদা আলাদা নম্বর দেওয়া এই রওয়ানায় উল্লেখ থাকত তারিখ ও ধার্য শুল্কের। কত পরিমাণ কি মালের জন্য ঐ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে তারও উল্লেখ থাকত রওয়ানায়[৯]।

১৮৩১ সালের ১লা জানুয়ারী (১৮ই পৌষ ১২৩৭) সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে তখনকার ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর নাব্যতা সম্পর্কে গু(ত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকা লিখেছে, 'ভাগীরথী নদী এই(ণে মহানা অবধি বরম্পুর পর্য্যন্ত একেবারে বন্দ কিন্তু বরম্পুর অবধি নবদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থানবিশেষে ন্যূন সংখ্যায় এক হাত জল আছে। জলঙ্গীতে যে নৌকা আড়াই হাত জল ভাঙ্গে সেই নৌকা এই(ণে গমন করিতে পারে যেহেতুক যে স্থানে অতি অল্প জল সেই স্থানে তত্তুল্য জল আছে। মাথাভাঙ্গায় পৌনে দুই হাত জল ভাঙ্গে যে নৌকা সে নৌকা এই(ণে চলিতে পারে'[১০]।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ডব্লু ডব্লু হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল থেকে জানা যায় যে তখন কেবলমাত্র গঙ্গানদীই সারা বছর নৌ পরিবহণ যোগ্য থাকত। ১০০ মণি নৌকোও স্বচ্ছন্দে এই পথ দিয়ে যেতে পারত। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে সিঙ্গা, বাঁশলোই এবং দ্বারকা নদী দিয়ে বর্ষাকালে ৫০ মণি (২টন) নৌকা পাওয়া যেত। জলঙ্গী নদীর অবস্থাও ছিল একই রকম। ভগবানগোলা, ধুলিয়ান, জঙ্গীপুরের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল গঙ্গানদী নির্ভর। গঙ্গার প্রবাহের উচ্চতার উপর নির্ভর করে ভগবানগোলা বন্দরের স্থান পরিবর্তিত হত। যখন গঙ্গার প্রবাহ মূল

ভগবানগোলার দূর দিয়ে বইত তখন বন্দরও নীচে নেমে আসত। একে বলা হ'ত আলাতলি বা নতুন ভগবানগোলা[১১]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে পরিবহণের ে(ত্রে জলপথের গু(ত্ব কমতে থাকে ও স্থলপথের গু(ত্ব বাড়তে থাকে। জেলা থেকে বিভিন্ন জায়গা অভিমুখী স্থলপথ নির্মাণের কর্মযজ্ঞ শু(হয়। স্থলপথ নির্মাণ করতে যে খরচ হচ্ছিল তা কিন্তু নেহাৎ শখ করে করা হচ্ছিল না। বাধ্য হয়েই ঐ খরচ করা হচ্ছিল। কোন সন্দেহ নেই সে যুগে নতুন রাস্তা করার চেয়ে জলপথের পরিবহণ ছিল কম ব্যয়সাধ্য এবং সময় সাশ্রয়কারী। তবে কেন জলপথের ব্যবহার কমিয়ে স্থলপথের ব্যবহার বাড়াতে হ'ল? এ প্র(্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সেই সময়কালের জেলার নদীগুলির বেহাল দশার মধ্যে। পর্যাপ্ত জলের অভাবে ত্র(মাগত পলি জমার ফলে নদীগুলো সেই কালপর্বে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত সরকারী তরফে নিয়মিত ব্যবস্থা নেওয়া হ'ত যাতে ভাগীরথী এবং জলঙ্গী নদী সারা বছর নৌ- পরিবহণের যোগ্য থাকে। নানা ব্যবস্থা নেওয়া সত্বেও নদীগুলোর মৃতপ্রায় হওয়া আটকানো যাচ্ছিল না। এ সত্ত্বেও ১৮৪১ সাল পর্যন্ত জেলার নদী বন্দরগুলো রীতিমতো কর্মব্যস্ত ছিল। জঙ্গীপুর ঘাটে ১৮৩৬ সালে টোল আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। ১৮৪১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় দেড় ল(টাকা।[১২] টোল আদায় বৃদ্ধির এই চিত্র দেখে কিন্তু নদীগুলোর ত্র(মবর্ধমান দুরাবস্থা কল্পনা করা শক্ত(কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল সেটাই। বাধ্য হয়ে ১৮৮৮ সালে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের একটা পৃথক বিভাগ খুলতে হ'ল। নদীয়া নদী বিভাগ (Nadia River Division) নামে এই পৃথক বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে। 'নদীয়া রিভার' নামে চিহ্নি(ত একগুচ্ছ নদীর মোট ৫০৯.৫ (পাঁচ শত সাড়ে নয়) মাইল দীর্ঘ নদীব(র খাত নিয়ন্ত্রণ ও র(ণাবে(ণ ছিল এই বিভাগের ঘোষিত দায়িত্ব। এ ঘটনা ১৯১১ সালের। এদের দায়িত্বে ছিল গঙ্গা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী ফরাক্কা খাত (দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল), ভাগীরথী নদী (১৫১ মাইল), ভৈরব-জলঙ্গী নদী (১৬৫.৫ মাইল), মাথাভাঙ্গা নদী (১৩৬ মাইল) এবং হুগলী নদীর ৩২ মাইল। এদের কাজ ছিল নদীগুলোকে নাব্য রাখা এবং নদীপথ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে টোল আদায় করা যা দিয়ে নদীপথগুলো পরিবহণযোগ্য রাখা হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় টোল আদায়ের কেন্দ্র ছিল জঙ্গীপুরে। এই বিভাগের টোল আদায়ের অন্য দুটি কেন্দ্র ছিল নদীয়া জেলার হাঁসখালি ও স্বরূপগঞ্জে। সরকারী হিসাবানুযায়ী শুধু ১৯১১ - ১২ সালেই মোট ১৭,০০০ নৌকা এই নদীপথ ব্যবহার করেছিল।[১৩]

নদীয়া রিভার বিভাগ যে কাজটা করত সেটা হচ্ছে নদীর প্রস্থ কমিয়ে গভীরতা বাড়ানো এবং তার নাব্যতা বজায় রাখা। তারা বাঁশের বা কাঠের গোঁজ পুঁতে এবং বাঁশের খলপা (ঝাঁপ) ব্যবহার করে নদীর প্রস্থ কমিয়ে দিত এবং নদীর শীর্ণ জলধারাকে সেই বাঁধালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করত। এর ফলে ীণ হলেও নদীতে একটা স্রোতের সৃষ্টি হ'ত এবং পলি অধঃ(পণের হার কমত। কিন্তু এই পদ্ধতি গঙ্গা ছাড়া ভাগীরথী এবং জলঙ্গীতে আংশিক ফলপ্রসূ হয়েছিল। কেননা অন্য সব নদীতে সারা বছর এমন জল পাওয়া যেত না যাতে কৃত্রিম ভাবে কোন স্রোত তৈরী করা যায়। তবু ভাগীরথীকে সারাবছর নাব্য রাখার জন্য চেষ্টা চলছিলই। কেননা কর্তৃপ(হিসাব করে দেখেছিল যে ভাগীরথীর জলপথ ববহার করলে উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থলপথের চেয়ে ৪২৫ মাইল কমে যায়। তৎকালীন বাংলার মুখ্য বাস্তুকার ১৯০৬ সালে হিসাব করে দেখেন যে ভাগীরথী নদীকে সারা বছর নাব্য রাখতে ড্রেজিং - এর জন্য খরচ পড়বে ১২৬০ ল(টাকা এছাড়াও প্রয়োজনীয় র(ণাবে(ণের জন্য যে খরচ হবে নদীপথ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে টোল আদায় করে তা তোলা যাবে না।[১৪] সর্বোপরি এমনও হতে পারে নদীয়া রিভার ডিভিশনের ছোট নদীগুলো এত বড় হয়ে গেল যে গঙ্গা ভাগীরথীর মূল জলধারা এই সব নদী দিয়ে বইতে পারে সে(ত্রে স্রেফ জলের অভাবে কলকাতা বন্দরকে শুকিয়ে মরতে হবে। কাজেই এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমানে জেলায় ফেরী পারাপার ছাড়া জলপথের ব্যবহার নেই বললেই চলে। যখন এ জেলায় বন্যা নিয়মিত অতিথি এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বাৎসরিক ঘটনা তখন প্রশাসনিক স্বার্থেই স্থায়ীভাবে জলপথ ব্যবহার করা প্রয়োজন। সে ে(ত্রে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও জেলাবাসীর ও প্রশাসনের অসহায়তা এত প্রকট হবে না। জলপথ নিয়মিত ব্যবহার হতে থাকলে জলযানেরও তেমন অভাব হবে না।

সম্প্রতি কলকাতা থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনের কথা হচ্ছে। হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাও নদীপথে যুক্ত(করার কথা উঠছে। শুধু মাল পরিবহণই নয় যাত্রী পরিবহণের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে গঙ্গার (ভাগীরথীর) জলধারাকে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ জলপথটি এক নম্বর জাতীয় জলপথ হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। এই জলপথটি নিয়মিত ভাবে ব্যবহার হলে তা যে শক্তি(সংর(ণের বিশেষ সহায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য মাত্র। জলপথ ব্যবহারের প(শক্তি(সংর(ণ ছাড়া আরেকটা যুক্তি(ও রয়েছে। ব্যবহারযোগ্য নাব্য জলপথ থাকলে তা র(ণাবে(ণের খরচ নেই কিন্তু স্থলপথ র(ণাবে(ণের খরচ প্রচুর।

ভ্যান ডেন ব্রুক ম্যাপ

স্থলপথ

মুর্শিদাবাদ জেলায় পথের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় পর্যটক হিউয়েন সাঙ (Yuan Chwang) এর বিবরণীতে। মগধ থেকে কামরূপ (আসাম) যাবার পথে তিনি রাজমহলের কাছে গঙ্গা পেরোন। কামরূপ (আসাম) থেকে সমতট এবং সেখান থেকে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হয়ে তিনি কর্ণসুবর্ণ যান এবং সেখানে একটি রমণীয় বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পথ ঃ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যান-ডেন-ব্রুক-এর আঁকা একটি মানচিত্রে (ফ্রাঙ্কয়েস ভ্যালেন্টিন এর আউধ এন নিউ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান এ প্রকাশিত) জেলার কিছু পথের খোঁজ পাওয়া যায়। ঐ মানচিত্রে দেখা যায় যে বিহার থেকে একটি প্রধান পথ গঙ্গার দ(ি ণ তীর ধরে পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল হয়ে সুতির কাছে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে। মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করার পর রাস্তাটি দ্বিধাবিভক্ত(হয়ে একটি শাখা মুর্শিদাবাদ এবং সেখান থেকে পলাশী অগ্রদ্বীপ, বর্ধমান, মেদিনীপুর হয়ে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।[১৫]

শেরশাহের অতিবিখ্যাত পাটনা অভিমুখী রাস্তা দিয়েই কোম্পানীর ফৌজ যাতায়াত করত। হুগলী, আমবোয়া, অগ্রদ্বীপ, কাশিমবাজার, সুতি হয়ে রাজমহল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা যাওয়া যেত এই রাস্তা দিয়ে। ১৭৬৩ খ্রীঃ মেজর অ্যাডাম এই রাস্তাই ব্যবহার করেছিলেন। কোম্পানীর ডাকও যেত এই রাস্তা দিয়েই।

১৭৭৩ সালে রবার্ট অর্মেকে লেখা কাশিমবাজারে কর্মরত এক ইংরেজ অফিসার গিলবার্ট আয়রণসাইডের চিঠি থেকে তখনকার মুর্শিদাবাদের প্রধান রাস্তাগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ওই চিঠি থেকে জানা যায় যে তখন কাশিমবাজার থেকে রাজমহল ভাগলপুর হয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ২৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়ে আগ্রা হয়ে দিল্লী পর্যন্ত যাওয়া যেত। আরেকটি রাস্তা দিয়ে মালদহ, দিনাজপুর হয়ে যাওয়া যেত রংপুর। এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৩ মাইল। ঐ চিঠি থেকে আরো জানা যায় যে তখন কাশিমবাজার সড়কপথে ঢাকা, কলকাতা, বর্ধমান এবং বীরভূমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত(ছিল।[১৬]

১৭৭৪ সালে অঙ্কিত মেজর রেনেলের আঁকা ' দি ম্যাপ অফ বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার' - এ মুর্শিদাবাদ জেলার রাস্তাঘাটের প্রাঞ্জল চিত্র পাওয়া যায় (সংযোজন অংশ দ্রষ্টব্য)। ঐ মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রিক পাঁচটি মূল রাস্তা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথম রাস্তাটি মুর্শিদাবাদ থেকে বড়নগর হয়ে বামিনিয়া এবং সেখান থেকে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে দেওয়ান সরাই,খামরা, সুতি, দেওনাপুর, ফরাক্কাবাদ হয়ে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। বামিনিয়া থেকে আরেকটি রাস্তা বের হয়ে মানকোর কাছে গঙ্গা পেরিয়ে গোদাগাড়ী নবাবগঞ্জ হয়ে শিবগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত। এখান থেকে একটি রাস্তা গেছে অবিভক্ত(দিনাজপুরে অন্য রাস্তাটি গৌড় ও মালদহ হয়ে প্রসারিত হয়েছে পূর্ণিয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় রাস্তাটি মুর্শিদাবাদ থেকে দ(ি ণদিকে বহরমপুরের উপর দিয়ে বড়ুয়া হয়ে প্রসারিত হয়েছে পলাশী পর্যন্ত। পলাশীতে দ্বিধাবিভক্ত(হয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে দ(ি ণ-পশ্চিমে আর একটি রাস্তা গেছে দ(ি ণ দিকে। দ(ি ণ-পশ্চিমের রাস্তাটি কাটোয়া, শ্রীখন্ড , নিগন, ভাতার, কর্জনা, কামনাড়া হয়ে পৌঁছেছে বর্ধমান। আর অন্য রাস্তাটি অম্বিতপুর হয়ে অগ্রদ্বীপের কাছে ভাগীরথী পেরিয়ে পাটুলি, বেলতলি হয়ে গেছে জাহাননগরে। এখান থেকে একটি রাস্তা গেছে পূর্বদিকে কৃষ(নগর অভিমুখে, আরেকটি রাস্তা দ(ি ণে প্রসারিত হয়ে সমুদ্রগড়, মীর্জাপুর,কালনা, ইঞ্চুরা (Inchura), দিঘরা, নয়াসরাই, জাড়বনি, বাঁশবেড়িয়া, ব্যান্ডেল , হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগরের উপর দিয়ে গৌরহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখান থেকে ভাগীরথী পার হয়ে রাস্তাটি বরানগর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আর আরেকটি পথ দ(ি ণ দিকে শ্রীরামপুর, আলীনগর, বালী, শাল্কিয়া হয়ে মেদিনীপুরের উপর দিয়ে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ থেকে আরেকটি পথ উত্তর-পূর্বে তুড়িশাল এবং মুড়ার কাছে গঙ্গা পেরিয়ে বোয়ালিয়া, ঘোড়াঘাট হয়ে রঙপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আরেকটি পথ মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে দ(ি ণ-পূর্বে আজিমগঞ্জ, হরিশঙ্কর, কুমারখালি, কামালডিহি হয়ে ঢাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পঞ্চম পথটি মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে শেরপুর, বাজিতপুর, সিউড়ি, রাজনগর হয়ে বিস্তৃত হয়েছে দেওঘর পর্যন্ত। [১৭]

১৮৬০ সালে ক্যাপ্টেন জে.ই.গ্যাস্ট্রেল তাঁর 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল রিপোর্ট অফ দ্য মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট'-এ জানাচ্ছেন যে , মুর্শিদাবাদে সত্যিকারের ভালো এবং স্থায়ী রাস্তা নেই। তবে যেগুলো আছে তার মধ্যে দ(ি ণ দিকে কৃষ(নগর হয়ে কলকাতা, পশ্চিমদিকে জিয়াগঞ্জ হয়ে বীরভূমের সিউড়ি, উত্তরে রাজমহল এবং পূর্বদিকে রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে রাজসাহী এবং রাজমহল - ভগবানগোলা সড়ক উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডব্লু ডব্লু হান্টারের ' এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' (নবম খন্ড) থেকে জানা যায় যে তখন মুর্শিদাবাদে পাকা রাস্তা ছিলনা বললেই চলে। তখন পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল দুটি বড় রাস্তা- বহরমপুর কৃষ(নগর সড়ক এবং বহরমপুর ভগবানগোলা সড়ক। প্রথম রাস্তাটির ২২ মাইল ছিল এই জেলার মধ্যে এবং দ্বিতীয়টির দৈর্ঘ্যই ছিল ২২ মাইল।

১৮৭১ সালে মুর্শিদাবাদ কালেক্টরেট্ থেকে পাঠানো একটি

রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তখন জেলায় মাত্র দুটি পাকা রাস্তা ছিল বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ রোড (দৈর্ঘ্য ১০.৭৫ মাইল) এবং আজিমগঞ্জ রোড (দৈর্ঘ্য ৭ মাইল)। সেই কাল পর্বের উল্লেখযোগ্য কাঁচা রাস্তাগুলো হলে জলঙ্গী রোড (২৭.৫ মাইল), মীরগঞ্জ রোড (১৬.৫ মাইল), বিউলিয়া রোড (২০ মাইল) কান্দী রোড (২১.৫ মাইল), মানকরা রোড (৩.৫মাইল), সুতি -রাজমহল রোড (২৯.৫ মাইল), ভগবানগোলা মূর্চা রোড (১১.৫ মাইল), জঙ্গীপুর-খামরা রোড (৫ মাইল), মুরারই রোড (১৪.৫ মাইল), পাকুড়-ধুলিয়ান রোড (১৫ মাইল)।[১৮]

বিংশ শতাব্দীর শু(তে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮৯ কিমি (৫৫.৫ মাইল) পাকা রাস্তা এবং ৮২৪ কিমি (৫১৫ মাইল) কাঁচা রাস্তা ছিল। এর বাইরে তখন আরো ১৩৯৫ কিমি (৮৭২ মাইল) গ্রামীণ সড়ক ছিল জেলায়। তখন জেলার প্রধান রাস্তাগুলো ছিল (১) ভগবানগোলা সড়ক - দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ কিমি (১৯.৭৫ মাইল) (২) জলঙ্গী রোড - দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ কিমি (২৮ মাইল) (৩) কান্দী - সাঁইথিয়া রোড (রাস্তাটির প্রায় ৪৮ কিমি, বেলগ্রাম পর্যন্ত অংশ, মুর্শিদাবাদের মধ্যে) (৪) কৃষ(নগর বা কলকাতা সড়ক -(রাস্তাটির ৩৫ কিমি অংশ জেলার অর্ন্তভুক্ত() (৫) বাদশাহী রোড -এটি ছিল মুঘল আমলের পুরোন রাস্তা, ১৮৭৪ সালে রাস্তাটি পুণর্নির্মিত হয়। (৬) পাটিকাবাড়ী রোড (২৮ মাইল দীর্ঘ রাস্তার নারায়ণপুর পর্যন্ত ৬ মাইল রাস্তা পাকা)। (৭) পাঁচগ্রাম রোড (১৬.২৫ মাইল) দীর্ঘ, নবগ্রাম এবং পাঁচগ্রামের মধ্যে এই রাস্তা বসিয়া বিল অতিত্র(ম করেছে। (৮) জঙ্গীপুর মুরারই রোড (১৪ মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটি জঙ্গীপুরের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের মুরারই স্টেশনকে যুক্ত(করেছে(১৪ মাইল রাস্তার ৭ মাইল রাস্তা মুর্শিদাবাদ জেলায়), (৯) পুরানো দেউড়ি-মুর্চা সড়ক—বহরমপুরের সাথে রাজসাহীর সদর রামপুর বোয়ালিয়ার সংযোগকারী রাস্তা। (১০) জিয়াগঞ্জ-জঙ্গীপুর সড়ক - ২৮ মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটি আসলে আগেকার রাজমহল সড়কের অংশ বিশেষ। (১১) রামনগর ধুলিয়ান রোড- ৮০.২৫মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটি ভাগীরথীর পশ্চিমপাড় দিয়ে সুতি ধুলিয়ান থেকে পলাশীর উল্টোদিকে রামনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ।[১৯]

এই মূল রাস্তাগুলো ছাড়াও আরো কিছু ছোটখাটো রাস্তা ছিল তৎকালীন মুর্শিদাবাদে। যেমন রঘুনাথগঞ্জ থেকে বোখারা (১১.৫ মাইল), আমতলা থেকে বেলডাঙ্গা (১৪.৫ মাইল), রেজিনগর থেকে গড়দুয়ারা (৩.২৫ মাইল) প্রভৃতি।

ওই কালপর্বেই জলপথগুলো দিনকে দিন নৌ-পরিবহণের অযোগ্য হয়ে উঠতে থাকায় এস আর জয়াকরের নেতৃত্বে গঠিত হয় রোড ডেভেলপমেন্ট কমিটি। ১৯২৮ সালে তাদের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯২৯ সালে তৈরী হ'ল সেন্ট্রাল রোড ফান্ড (C.R.F)। স্থির হল যে পেট্রোলের উপর সারচার্জ বসিয়ে আদায়ীকৃত অর্থ থেকে প্রদেশগুলোকে রাস্তা তৈরী ও মেরামতির জন্য বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হবে। ১৯৩৪ সালে বাংলার রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য সমী(ার উদ্দ্যেশ্যে এ জে কিং (A.J. King) - কে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত(করা হ'ল। মুর্শিদাবাদের রাস্তাঘাট সম্পর্কে বিশদ সমী(ার পর তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন তা থেকে জানা যায় যে ১৯৩৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে কাঁচা ও পাকা রাস্তা মিলিয়ে মোট রাস্তা ছিল ৫৯৮১ কিমি (৩৭৩৮ মাইল)। এদের মধ্যে সরাসরি জেলা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে ছিল ১১৭ কিমি (৭৩ মাইল) পাকা এবং ৯৫২ কিমি (৫৯৫ মাইল) কাঁচা রাস্তা। ১৬২৬ কিমি (১০১৬ মাইল) কাঁচা রাস্তা ছিল স্থানীয় বোর্ড (Local Board) এর তত্ত্বাবধানে। পুরসভা সমূহের তত্ত্বাবধানে ছিল ২৪ কিমি (১৫ মাইল) পাকা রাস্তা এবং ৬২ কিমি (৩৯ মাইল) কাঁচা রাস্তা। এছাড়া সরাসরি ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ছিল ৩২০০ কিমি (২০০০ মাইল) কাঁচা রাস্তা। বিস্তারিত সমী(ার পর কিং সাহেব কর্তৃপ(ের কাছে ৬৭ কিমি (৪২ মাইল) পাকা রাস্তা এবং ৩১৭ কিমি (১৯৮ মাইল) কাঁচা রাস্তার উন্নয়ন এবং ৪৬ কিমি (২৯ মাইল) নূতন রাস্তা তৈরীর সুপারিশ করেন। প্রস্তাব তৈরীর সময় তিনি ধরে নেন, যে কোন রাস্তা রেললাইন বা স্টীমার সার্ভিস তার চারপাশের ৮ কিমি (৫ মাইল) এলাকার প্রয়োজন মেটাবার প(যথেষ্ট। পরিকল্পনাকালে তিনি সেতুবিহীন নদী বা অন্য কোন বাধার কথা বিবেচনায় আনেন নি। তাঁর এই পরিকল্পনায় প্রতি ৭.৭ বর্গ মাইল (১৯.৭১২ বর্গ কিমি) এলাকার জন্য ১ মাইল (১.৬ কিমি) রাস্তা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে তখন পর্যন্ত জেলায় বিদ্যমান রাস্তা রেলপথ বা স্টীমার সার্ভিসের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত রাস্তাগুলি তৈরী করা গেলে জেলার ৯৯.৫ শতাংশ মানুষ রাস্তাঘাট বা পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি হিসাব করে দেখান যে শুধুমাত্র স্থলপথগুলিই জেলার ৮৫.৫ শতাংশ এলাকার (১৭৮৭ বর্গমাইল) মানুষের সেবায় লাগতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তখনও জেলার ১৮ টি থানার মধ্যে ৪ টি থানার সঙ্গে জেলা সদরের সরাসরি কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না [২০] (সারণী - ১০.১)।

নাগপুর কনফারেন্স ঃ রাস্তা বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা শু(হয় বিংশ শতাব্দীর ৪০ দশকের প্রথমদিকে। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকার সেন্ট্রাল রোড ফান্ড-এর অবলুপ্তি ঘটান এবং সুসংহত রাস্তা নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৪৩ সালে নাগপুর কনফারেন্স আহ্বান করেন। এই কনফারেন্সে তিন জাতীয় রাস্তা তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়- জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক

সারণী - ১০.১

কিংস প্যানে প্রস্তাবিত রাস্তাসমূহ (মুর্শিদাবাদ)

রাস্তার অবস্থান		আনুমানিক দৈর্ঘ্য		রাস্তার শ্রেনী
হইতে	পর্যন্ত	মাইল	কিমি	
মুরান্দী	রামনগরঘাট	৬৫	১০৪	প্রাদেশিক
বহরমপুর	ফাজিলনগর	২১	৩৪	,,
কান্দী	সুলতানপুর	১৩	২১	,,
বানজেটিয়া	গোপালপুর	২৯	৪৬	জেলা-মুখ্য
রাধারঘাট	কমলপুর	১৯	৩০	,,
বড়এ(া	চকগোপাল	২৩	৩৭	,,
রাইন্দা	আজিমগঞ্জ	৯	১৪	,,
সেলমেল	রঘুনাথগঞ্জ	১৩	২১	,,
মিত্রপুর	মীর্জাপুর	৬	১০	,,
ভরতপুর	বাজারসৌ	৭	১১	,,
গোকর্ণ	সাটুই	৯	১৪	,,
ইসলামপুর	জিয়াগঞ্জ	২৭	৪৩	,,
ফাজিলনগর	বাসাবাড়ী	২০	৩২	জেলা- মুখ্য

সূত্রঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ , মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯।

সারণী- ১০.২

৩১শে মার্চ, ১৯৮১ তে রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত(জেলার গ্রামসংখ্যা

গ্রামের জন সংখ্যা	জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা	সব মরশুমে যাতায়াতের উপযুক্ত(রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত(গ্রাম	ফেয়ার ওয়েদার রোড দিয়ে সংযুক্ত(গ্রাম	কোন ধরণের রাস্তা দিয়েই সংযুক্ত(নয় এমন গ্রাম
১৫০০ এবং অধিক	৭০০	২৯৯	৯৩	৩০৮
১০০০-১৫০০	২৮৫	১০৬	৩০	১৪৯
৫০০-১০০০	৪৩১	১৩৫	৫৩	২৪৩
৫০০ এর নীচে	৫০৭	১৫১	৬৭	২৮৯
মোট	১৯২৩	৬৯১	২৪৩	৯৮৯

সূত্রঃ টোয়েন্টি ইয়ার রোড ডেভেলপমেন্ট প্যান (১৯৮১-২০০১) ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, পার্ট-২, পাবলিক ওয়ার্কর্স (রোডস) ডাইরেক্টরেট, ১৯৮১।

সারণী- ১০.৩
মুর্শিদাবাদে পি ডব্লিউ ডি, স্থানীয় বোর্ড এবং পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তা

বৎসর	পি ডব্লিউ ডি			স্থানীয় বোর্ড			পুরসভা		
	সারফেস্‌ড	আন সারফেস্‌ড	মোট	সারফেস্‌ড	আন সারফেস্‌ড	মোট	সারফেস্‌ড	আন সারফেস্‌ড	মোট
১৯৮৫ - ৮৬	১১২৮	৮০	১২০৮	২২১.৭	১৬৬.৬৫	৩৮৮.৩৫	২২১.৭	১৬৬.৬৫	৩৮৮.৩৫
১৯৮৬ - ৮৭	১১৪০	৬৮	১২০৮	২৩০.২৫	৯৭.০৩	৩২৭.২৮	২৩০.২৫	৯৭.০৩	৩২৭.২৮
১৯৮৭ - ৮৮	১১৫৪	৬১	১২১৫	৩১৬.৮১	১৪০.৩৫	৪৫৭.১৬	৩১৬.৮১	১৪০.৩৬	৪৫৭.১৬
১৯৮৮ - ৮৯	১১৬৩	৫৪	১২১৭	২১৬.২৬	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	৩১৭.৯৭	১৫৮.৪১	৪৭৬.৩৮
১৯৮৯ - ৯০	১১৬৩	৫৬	১২১৯	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	২০৭.৫২	৭৭.৮৬	২৮৫.৩৮
১৯৯০ - ৯১	১১৯৬	৩১	১২২৭	৪০২	১৮৮৮	২২৯০	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত
১৯৯১ - ৯২	১২০৮	২৩	১২৩১	৪০৫	১৮৮৫	২২৯০	২১৪.৪২	১১২.০৫	৩২৬.৪৭
১৯৯২ - ৯৩	১০৯৪	৯০	১১৮৪	৪১৩	১৮৭৭	২২৯০	৩০৪.৪২	১৯২.০৫	৪৯৬.৪৭
১৯৯৩ - ৯৪	১১০০	৮৪	১১৮৪	৪৪০	১৮৫০	২২৯০	৪৪৯.৪২	২৪৫.৬৭	৬৯৫.০৯
১৯৯৪ - ৯৫	১১১০	৭৪	১১৮৪	৪৪৯	১৮৪১	২২৯০	৪৬০	৩২৫	৭৮৫
১৯৯৫ - ৯৬	১১১৪	৭০	১১৮৪	৪৫২	১৭২৬	২১৭৮	৪১২.৩৬	৩৪৯.৭৮	৭৬২.১৪
১৯৯৬ - ৯৭	১১১৪	৭০	১১৮৪	৪৬০	১৭১৮	২১৭৮	৪৩৫.২৩	৩৭৭.০৬	৮১২.২৯
১৯৯৭ - ৯৮	১১১৪	৭০	১১৮৪	৪৭৫	১৭১২	২১৮৭	৫৬০.৯৬	৪৭৫.৭৪	১০৩৬.৭০
১৯৯৮ - ৯৯	১১১৮.৫	৬৫	১১৮৩.৫	৪৯৭	১৬৯০	২১৮৭	৫৬৯.৮৮	৫৪৯.১০	১১১৮.৯৮
১৯৯৯ - ০০	১১১৮.৫	৬৫	১১৮৩.৫	৫২৮	১৬৫৯	২১৮৭	৫৬৯.৮৮	৫৪৯.১০	১১১৮.৯৮
২০০০ - ০১	১১১৯	৬৫	১১৮৪	৫৩১	১৬৪৭	২১৭৮	৭৫০.৮৭	৪৭৫.৬২	১২২৬.৪৯

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ ১৯৮১, ১৯৮৬ - ৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ১৯৯৯ - ২০০০, ২০০১ ব্যুরো অব্ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এবং স্থানীয় সড়ক। ঐ কনফারেন্সে স্থির হয় স্থানীয় সড়ক হবে দু'ধরণের— (১) জেলা সড়ক- এগুলি জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কের সঙ্গে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করবে। (২)গ্রাম্য সড়ক- এগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে। নাগপুর কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিং সাহেবের পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হল। ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন্দ্র সরকার পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্য রাস্তা তৈরী ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট স্বাধীন হল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য তৈরী হল প্ল্যানিং কমিশন। রাস্তা তৈরীর জন্য তারা যে নির্দেশিকা দিল তাতে বলা হল যে জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়ক হবে ৩২ ফুট চওড়া যার ১২ ফুট থাকবে পিচের আস্তরণে। বাঁক এবং রাস্তার সংযোগস্থল এমনভাবে তৈরী হবে যাতে ঘন্টায় ৬৪-৮০ কিমি (৪০-৫০ মাইল) বেগে ধাবমান গাড়ীরও কোন অসুবিধা না হয়। এছাড়া ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য রাস্তার ধারে বেশ কিছু জমি সংরক্ষিত হবে। অনুরূপভাবে জেলা সড়ক হবে ২৪ ফুট চওড়া এবং গ্রাম্য সড়ক হবে ১৬ ফুট চওড়া। [২১]

১৯৮১ সালে থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকগুলি রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাবনা হিসাবে আলোচনা করতে গিয়ে ঐ পরিকল্পনা পুস্তকে কিছু চমকপ্রদ তথ্য দেওয়া হয়েছে। ঐ তথ্য থেকে জানা যায় যে পরিকল্পনা গ্রহণের সময় (৩১/৩/৮১) জেলার ১৯২৩ টি গ্রামের মধ্যে ৬৯১ টি গ্রামে সব মরশুমে চলার মতো রাস্তা (all weather roads) ছিল, এছাড়া ২৪৩ টি গ্রাম সংযুক্ত ছিল এমন রাস্তার সঙ্গে যেগুলো বছরের বেশ কিছুটা সময় অগম্য হয়ে উঠত। আর ৯৮৯ টি গ্রামে কোন ধরনের রাস্তাই ছিল না, অর্থাৎ জেলার ৫১.৪৩ শতাংশ গ্রাম কোন রকম রাস্তা দিয়েই সংযুক্ত ছিল না। (সারণী-১০.২)

ঐ পরিকল্পনায় কুড়ি বছরে জেলায় মোট ৭৯ টি রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছিল ১২৮৬ কিমি। এদের মধ্যে তপশীলি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকার রাস্তা ধরা হয়েছিল ৬৭ কিমি এবং তপসীলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার রাস্তা ছিল ১৬৫ কিমি।

মোট পাঁচটি পর্যায়ে রাস্তাগুলোর কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়েছিল। পর্যায়গুলো ছিল নিম্নরূপ -

(১) জমি অধিগ্রহণ ও মাটির কাজ প্রথম বছর ৬ শতাংশ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছর ৮ শতাংশ করে এবং পরবর্তী ১৩ বছরে ৬ শতাংশ করে (১৯৯৭ পর্যন্ত)।

(২) কালভার্ট প্রথম বছর ৬ শতাংশ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছর ৮ শতাংশ করে এবং পরবর্তী ১৩ বছর ৬ শতাংশ করে (১৯৯৭ পর্যন্ত)।

(৩) মেটালিং পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত কাজ তৃতীয় বছর থেকে ১৮ তম বছর পর্যন্ত ৬ শতাংশ করে ১৯ তম বছরে বাকী ৪ শতাংশ (২০০০ পর্যন্ত)।

(৪) বিটুমিনের কাজ চতুর্থ বৎসর থেকে ১৯ তম বছর পর্যন্ত ৬ শতাংশ করে এবং ২০ তম বছরে ৪ শতাংশ (২০০১ পর্যন্ত)।

(৫) গু(ত্বপূর্ণ সেতু চতুর্থ বৎসর থেকে ২০ তম বছর (২০০১ পর্যন্ত)।[২২]

১৯৯৯-২০০০ এ জেলায় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (P.W.D) -এর নিয়ন্ত্রণে মোট রাস্তা ছিল ১১৮৩.৫ কিমি। এর মধ্যে সারফেস্ড (Surfaced) রাস্তা ১১১৮.৫ কিমি এবং আনসারফেসড্ (Unsurfaced) রাস্তা ৬৫ কিমি। এছাড়া স্থানীয় বোর্ডের এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ২১৮৭ কিমি রাস্তা এর মধ্যে সারফেসড রাস্তা ৫২৮ কিমি এবং আনসারফেসড রাস্তা ১৬৫৯ কিমি। এসবের বাইরে পুরসভাগুলির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মোট ১১১৮.৯৮ কিমি রাস্তা। বর্তমানে (২০০০-২০০১) জেলায় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (P.W.D) -এর নিয়ন্ত্রণে মোট রাস্তা আছে ১১৮৪ কিমি। এর মধ্যে সারফেস্ড রাস্তা ১১১৯ কিমি এবং আনসারফেস্ড রাস্তা ৬৫ কিমি। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে আছে ২১৭৮ কিমি রাস্তা যার মধ্যে সারফেস্ড ৫৩১ কিমি এবং আনসারফেস্ড রাস্তা ১৬৪৭ কিমি। এসবের বাইরে পুরসভাগুলির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৭৫০.৮৭ কিমি সারফেস্ড এবং ৪৭৫.৬২ কিমি আনসারফেস্ড রাস্তা। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (রোডস্) যে ১১৮৪ কিমি রাস্তা দেখভাল করে তার মধ্যে জাতীয় সড়কের অংশ ১৩৪ কিমি, রাজ্য সড়কের অংশ ২৩৭ কিমি, জেলা সড়ক ৩১৬ কিমি এবং গ্রাম্য রাস্তা ৪৯৭ কিমি।[২৩]

জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়ক ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়ে গেছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। এটি কলকাতার সঙ্গে শিলিগুড়িকে যুক্ত(করেছে। রেজিনগরের কাছে জাতীয় সড়কটি মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছে। এরপর বেলডাঙ্গা, সারগাছি, বহরমপুর, পলষন্ডা, উমরপুর, ফরাক্কা হয়ে সড়কটি ফরাক্কা সেতু পেরিয়ে মালদহে প্রবেশ করেছে। এ জেলার উপর দিয়ে গেছে দুটি রাজ্য সড়কও। মুর্শিদাবাদ জেলার সড়ক যোগাযোগের ে(ত্রে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন মোরগ্রাম -পানাগড় সুপার হাইওয়ে। ১৯৯৯ সালের ২৩ শে জুন রাস্তাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ২২৬ কোটি ঋণ নিয়ে নির্মাণ করা এই রাস্তাটি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজপথগুলির অন্যতম।

সারণী- ১০.৪

জেলার রাজ্য সড়ক সম্পর্কিত তথ্য

রাজ্য সড়ক নম্বর-৭, মোট দৈর্ঘ্য-৭৮.১৫ কিমি

রাস্তার নাম	তত্ত্বাবধায়ক	দৈর্ঘ্য (কিমি)
কুলি-মোড়গ্রাম রোড	হাইওয়ে ডিভিশন-I, II পি.ডব্লু.ডি-II	৩৬.৪৫
কুলি-বড়এ(া-গ্রামশালিকা রোড	হাইওয়ে ডিভিশন-II	৮.৪০
সালার-ভরতপুর রোড	হাইওয়ে ডিভিশন-II	১৩.৩০
গ্রামশালিকা-মজলিশপুর রোড	হাইওয়ে ডিভিশন-II	৯.৭২
রামজীবনপুর-মজলিশপুর রোড	হাইওয়ে ডিভিশন-II	১০.২৮

রাজ্য সড়ক নম্বর-১১, মোট দৈর্ঘ্য-১৫৭.৬০ কিমি

বহরমপুর-কান্দী	পি.ডব্লু.ডি-I	৩০.০০
কান্দী-সুলতানপুর	পি.ডব্লু.ডি-I	২০.৩০
রঘুনাথগঞ্জ ব্রিজ থেকে ওমরপুর মোড়	পি.ডব্লু.ডি-I	৩.৬০
চুনাখালি-রৌশনবাগ (বি.এস.এফ ক্যাম্প)	পি.ডব্লু.ডি-II	৬.০০
চুনাখালি-জলঙ্গী	পি.ডব্লু.ডি-II	৪৮.২০
বহরমপুর-ভগবানগোলা -লালগোলা-রঘুনাথগঞ্জ	পি.ডব্লু.ডি-II	৪৯.৫০

সূত্র ঃ হাইওয়ে ডিভিশন I,II ও পি.ডব্লু.ডি-I,II

যানবাহন ঃ প্রাচীন মুর্শিদাবাদের প্রধান যানবাহন ছিল নৌকা আর পাল্কী । গ(মোষের গাড়ীর ব্যবহারও শু(হয়েছে প্রাচীন কাল থেকেই। চাকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই চাকা ব্যবহার করে পরিবহণকে সহজসাধ্য করার প্রচেষ্টা শু(হয়ে গেছিল। তবু যেহেতু খুব প্রাচীনকালে স্থলপথের তেমন বিকাশ হয়নি সেহেতু সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সবাই নির্ভরশীল ছিলেন জলপথের

উপর। আর প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্ভব হয়েছিল নানারকম জলযানের। ডিঙ্গি, ছিপ, পানসী, বজরা, ভাউলিয়া, পিনিস, কত বিচিত্র ছিল সেইসব জলযান। রাজা মহারাজা, নবাব নাজিম বা অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তি(রা যে সব জলযান ব্যবহার করতেন তাদের সুন্দর কাব্যিক নামও দেওয়া হ'ত। ময়ূরপঙ্খী, মোহসুন্দর, পুলারখোসা, লোলডিঙ্গি, গাড়ামর্দন, হাতিমর্দন, রংমহাল, মৎস্যমুখী, হংসমুখী ইত্যাদি তার নিদর্শন।

ইংরেজ আমলে কোম্পানীর কর্মচারীরা কর্মসূত্রে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লে কলকাতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ র(ার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৮৩৬ সালে কলকাতা এলাহাবাদ স্টীমবোট সার্ভিস চালু হয়ে যায়। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ(নাথ উদ্যোগ নিলেন ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ সার্ভিস চালু করার জন্য। সৈদাবাদে গুরগিন খাঁর বাগানবাড়ী কিনে নিয়ে সেখানে তিনি গড়ে তোলেন জাহাজ তৈরীর কারখানা। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

অষ্টাদশ শতকে জেলাঞ্চলের নদীগুলির নাব্যতা কমতে থাকলে স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে থাকে এবং স্থলযানের বিকাশ ঘটতে থাকে। সম্ভ্রান্ত লোকজন আগে থেকেই ব্যবহার করত পাল্কী। এই পাল্কীও ছিল তাঁদের বিত্ত প্রদর্শনীর (ে ত্র। দামী কাঠে তৈরী সোনা, (পোর কাজকরা সেইসব পাল্কীর ভেতরে থাকত পু(গদী, ঠেস দেবার তাকিয়া। সাধারণ লোক ব্যবহার করত ডুলি। তবে নেহাৎ দায়ে পড়লে বা অশক্ত(অসুস্থ লোককে স্থানান্তরিত করতেই সাধারণ মানুষ ডুলির শরণাপন্ন হ'ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে ঘোড়ার গাড়ী জনপ্রিয় হয়। ১৮২৭ সালে পাল্কী বেহারাদের ধর্মঘটে তিতিবিরক্ত(হয়ে ব্রাউনলো নামে এক সাহেব পাল্কীর দুই ডান্ডা খুলে আর তলায় চারটে চাকা লাগিয়ে তৈরী করেন এক ঘোড়ায় টানা গাড়ী। আবিষ্কর্তার নামে এই গাড়ীর নাম দেওয়া হয় ব্রাউনবেরী। নানা ধরণের ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবহার জেলাঞ্চলে চালু ছিল। ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, টমটম, ছ্যাকরা গাড়ী, জুড়ি গাড়ী, ফিটন, চৌঘুরী, চেরোট, অমনিবাস, ব্যা(শ, গিগ, টাঙ্গা ইত্যাদি বহু বিচিত্র নামের ঘোড়ার গাড়ী একদা ব্যবহৃত হত জেলাঞ্চলে। এখনও ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হয় তবে টমটম বা টাঙ্গা ছাড়া অন্য ধরণের ঘোড়ার গাড়ী আর জেলায় তেমন দেখা যায় না।

বিংশ শতাব্দীর মোটামুটি দ্বিতীয় শতক থেকেই জেলায় এসে যায় যন্ত্রচালিত যানবাহন। আসে রিক্সা। এখন জেলার প্রধান যানবাহন এইসব যন্ত্রচালিত গাড়ীই। নৌকার ব্যবহার এখনও প্রচলিত তবে তা মূলত ফেরী পারাপার বা মাছ ধরার কাজেই ব্যবহৃত হয়। পাল্কীর ব্যবহার আর আর নেই। স্থানীয়ভাবে যাতায়াতের জন্য মানুষ রিক্সা বা ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করে থাকে। গ(ের গাড়ী বা

সারণী - ১০.৫

প্রকৃতি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে নিবন্ধীকৃত গাড়ীর সংখ্যা

বৎসর ৩১শে মার্চপর্যন্ত	মালবাহী গাড়ী	মোটর গাড়ী ও জিপ	মোটর সাইকেল ও স্কুটার	ট্যাক্সি ও কন্ট্রাঃ ক্যারেজ	মিনি বাস	বাস	অটো রিক্সা	ট্রাক্টর ওট্রেলার	অন্যান্য	মোট
১৯৯০	১০৫৩	৫৮৭	৭৪৪৩	১২৫	১৫	২৫৩	১১	৪৪৬	৪৪	৯৯৭৯
১৯৯১	১১৫৮	৬১৯	৯৩৭৫	১৩৮	১৫	২৫৭	৩৯	৫৭৭	৪৭	১২২২৫
১৯৯২	১২৫৪	৬৪৪	১০৭৩১	১৪৭	১৬	২৬১	৫৮	৬৯১	৪৯	১৩৮৫১
১৯৯৩	১৫২৫	৭৯৮	১২০৩৪	১৫৩	১৬	২৮০	৯৮	৮৭৬	৬১	১৫৮৪১
১৯৯৪	১৭০২	৮৮৭	১৩২২৫	১৬৪	১৭	৩০৯	১৭৫	১০৫৬	৬৯	১৭৬০৪
১৯৯৫	১৯৩৯	৯৬৬	১৪৮১৫	১৭৪	১৭	৩৩৩	২০৪	১২৩৮	৭৪	১৯৭৬০
১৯৯৬	২১৮১	১০৫১	১৬২৩৮	১৯৮	২৪	৩৫২	২৩৫	১৩৭৮	৯৩	২১৭৫০
১৯৯৭	২২৯৭	১১৩৮	১৭৩২৪	২১৬	২৯	৩৬০	২৪২	১৪২৬	১০৮	২৩১৪০
১৯৯৮	২৫১৪	১১৮২	১৯৮৫৫	২৪৬	৩০	৩৮৭	২৪২	১৮৯১	২১৭	২৬৫৬৪
১৯৯৯	২৭৩২	১২৯১	২২৭০৫	২৬৭	৩২	৪৩১	২৪৭	২৩০৯	৩৪৯	৩০৩৬৩
২০০০	২৮৪৬	১৪৫০	২৫৭৯২	২৯৬	৩৩	৪৩৯	২৪৭	২৭৬৩	৩৭৪	৩৪২৪০
২০০১	২৯৪১	১৫৯০	২৯৫১২	৩৩৫	৩৬	৪৫২	২৪৭	৩১৪৩	৩৯৩	৩৮৬৪৯

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ ১৯৯৪, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১ ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স, পঃবঃ সরকার।

সারণী - ১০.৬
জেলায় নিবন্ধীকৃত গাড়ীর সংখ্যা

পর্যন্ত	গাড়ীর সংখ্যা
৩১-৩-১৯৫৯	৭৪৩
৩১-৩-১৯৬০	৭৮৯
৩১-৩-১৯৬১	৮৬৮
৩১-৩-১৯৬৭	১৬৯৯
৩১-৩-১৯৬৮	১৭৭৫
৩১-৩-১৯৬৯	১৯৭৩
৩১-৩-১৯৭০	২১৭৪
৩১-৩-১৯৭৭	১৮৪৬
৩১-৩-১৯৮৪	৫১৭৮
৩১-৩-১৯৮৬	৫৭০৯
৩১-৩-১৯৮৭	৫৯৫৭
৩১-৩-১৯৮৮	৭০৫২
৩১-৩-১৯৮৯	৮১৭৪
৩১-৩-১৯৯০	৯৯৭৭
৩১-৩-১৯৯১	১২২২৫
৩১-৩-১৯৯২	১৩৮৫১
৩১-৩-১৯৯৩	১৫৮৪১
৩১-৩-১৯৯৪	১৭৬০৪
৩১-৩-১৯৯৫	১৯৭৬০
৩১-৩-১৯৯৬	২১৭৫০
৩১-৩-১৯৯৭	২৩১৪০
৩১-৩-১৯৯৮	২৬৫৬৪
৩১-৩-১৯৯৯	৩০৩৬৩
৩১-৩-২০০০	৩৪২৪০
৩১-৩-২০০১	৩৮৬৪৯

সূত্রঃ সেন্সাস হ্যান্ডবুক ১৯৬১ ও ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ড বুক ১৯৮১, ১৯৮৬-৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ১৯৯৯-২০০০,২০০১।

মোষের গাড়ী প্রচলিত থাকলেও যাত্রীবহনে তা ব্যবহৃত হয় না। মূলতঃ পণ্য পরিবহণের কাজেই গ(র গাড়ী বা মোষের গাড়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পণ্য পরিবহণে ট্রাকটর বা ট্রাকের ব্যবহার শু(হয়ে যাওয়ায় গ(মোষের গাড়ীর ব্যবহারও অতি দ্রুত কমে আসছে।

৩১ শে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত জেলায় নিবন্ধীকৃত বিভিন্ন যানবাহনের মোট সংখ্যা ৩৮৬৪৯। এরমধ্যে মালবাহী গাড়ীর সংখ্যা ২৯৪১, মোটর গাড়ী ও জিপ ১৫৯০, ট্যাক্সি ও কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ ৩৩৫, মিনিবাস ৩৬ , বাস ৪৫২ , অটোরিক্সা ২৪৭, ট্রাকটর ও ট্রেলর ৩১৪৩, মোটর সাইকেল ২৯৫১২ এবং অন্যান্য গাড়ী ৩৯৩ টি। ল(নীয় যে জেলার নিবন্ধীকৃত যানবাহনের ৭৬ শতাংশই মোটর সাইকেল ও স্কুটার। সমস্ত রকম যানবাহনের মধ্যে স্কুটার ও মোটর সাইকেলের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। ১৯৫৯ সালে জেলায় মোটর সাইকেলের সংখ্যা (নিবন্ধীকৃত) ছিল ৫৬ এবং নিবন্ধীকৃত বাসের সংখ্যা ছিল ১৪০ , ১৯৬০ সালে ঐ সংখ্যা দুটি ছিল যথাত্র(মে ৫৯ এবং ১৪৩। ১৯৬১ সালে জেলায় নিবন্ধীকৃত মোটর সাইকেলের মোট সংখ্যা ছিল ৬০ টি যেখানে বাসের সংখ্যা ছিল ১৪৮। ১৯৫৯ সালের তুলনায় ২০০১ সাল পর্যন্ত বাসের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৩.২২ গুণ অন্যদিকে ঐ একই কালপর্বে মোটর সাইকেল ও স্কুটার বৃদ্ধির হার ৫২৭ গুণ। কোন সন্দেহ নেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি আশানুরূপ নয়। (সারণী ১০.৫ ও ১০.৬)

রেলপথঃ স্টকটন ডার্লিংটন নামে পরিচিত পৃথিবীর প্রথম রেললাইনটি বসানো হয়েছিল ইংল্যান্ডে। ১৮২১-২৫ সালের কালসীমায় এই রেললাইন বসানো হয়। বাস্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জর্জ স্টিফেনসন ছিলেন এই লাইন তৈরীর মুখ্য স্থপতি। তবে এই লাইনে ট্রেনের প্রাথমিক গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১২ মাইল। এরপর লিভারপুল ম্যাঞ্চেস্টার লাইনে ট্রেন চলে ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে।

ইংল্যান্ডে পরিবহণের এই নতুন মাধ্যমটি জনপ্রিয় হবার সাথে সাথেই কিছু দূরদর্শী ইংরেজ ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ভারতে রেললাইন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ও মোগলদের রাজধানী দিল্লীর মধ্যে রেললাইন স্থাপনের জন্য ১৮৪৫ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডে এক কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৈরী হয় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী। জর্জ স্টিফেনসনের ভাইপো রোল্যান্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন ১৮৪৫-৪৬ সালে প্রস্তাবিত রেলপথের সমী(া করেন।

স্টিফেনসনের এই কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে কলকাতার কিছু হুজুগে সাহেব ভাগীরথীর পূর্বপাড় ধরে কলকাতা থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে নামে একটি কোম্পানী গঠন করেন। ঠিক হয় যে কোম্পানীর মূলধন হবে ১৫ ল(টাকা। টাকাও তোলা হয় বেশ কিছু, এলাহি খানাপিনাও হ'ল টাউন হলে। কিন্তু আসল কাজটাই হ'ল না। লোক ও টাকা দুই-ই হাওয়া হয়ে গেল। যদি কোম্পানী গায়েব হয়ে না যেত তবে হয়ত ভারতে প্রথম রেল চলত মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়েই।[২৪]

জেলার প্রথম রেলপথটি নির্মাণ করেছিল ইন্ডিয়ান ব্রাঞ্চ রেলওয়ে কোম্পানী। নলহাটি আজিমগঞ্জ স্টেট রেলওয়ে নামে পরিচিত চার ফুট গেজের এই রেলপথে প্রথম ট্রেন চলে ১৮৬৩ সালের ২১ শে ডিসেম্বর। বীরভূম জেলার লুপ লাইনের নলহাটি স্টেশনের সঙ্গে আজিমগঞ্জকে যুক্ত(করা এই লাইনটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৩.৬ কিমি (২৭.২৫ মাইল) যার মধ্যে ২৪ কিমি (১৫ মাইল) রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। ১৮৭২ সালের ৩১ শে মার্চ সরকার লাইনটিকে অধিগ্রহণ করে এবং লাইনটি নলহাটি স্টেট রেলওয়ে নামে পরিচিত হয়। ১৮৯২ সালের ১ লা এপ্রিল লাইনটিকে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত(করে নেওয়া হয়। ঐ বছরই ১৫ই জুলাই লাইনটির গেজ পরিবর্তন করে এটিকে সাড়ে পাঁচ ফিট গেজের রেলপথে পরিণত করা হয়। নলহাটি আজিমগঞ্জ লাইট রেলওয়ের শেষ ভারতীয় ম্যানেজার ছিলেন রামগতি মুখোপাধ্যায়। প্রশাসনিক কাজে তাঁর দ(তার স্বীকৃতি স্বরূপ এই লাইনের জন্য ১৮৬২ সালে ফ্রান্স থেকে আনা ইঞ্জিনটির নাম দেওয়া হয়েছিল রামগতি। এই লাইনের গেজ পরিবর্তনের পর ছোট ইঞ্জিনটিকে নিয়ে যাওয়া হয় জামালপুরে। সেখানে শান্টিং ইঞ্জিন হিসাবে কিছুদিন ব্যবহার করার পর এটিকে আবর্জনা ফেলার গাড়ী টানার জন্য আনা হয় কলকাতা কর্পোরেশনে। বর্তমানে এই বিখ্যাত ইঞ্জিনটি দিল্লীর রেল মিউজিয়ামে রাখা আছে। শতবর্ষ অতিত্র(ম করে আসা এই লাইনটিতে বর্তমান স্টেশনগুলোর নাম হল আজিমগঞ্জ জংশন, আজিমগঞ্জ সিটি, গোঁসাইগ্রাম হল্ট, বারালা, সাগরদীঘি, মোরগ্রাম, লোহাপুর, তকিপুর এবং নলহাটি জংশন। এর মধ্যে প্রথম ছটি স্টেশন মুর্শিদাবাদ জেলায়। এই লাইন দিয়ে বর্তমানে সারদিনে পাঁচটি ট্রেন যাওয়া-আসা করে।

১৮৭৬ সালের ১লা মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে একটি নতুন রেললাইনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল আজিমগঞ্জের ধনকুবের রায় ধনপত সিং বাহাদুর তাঁর নিজের খরচে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের রাণাঘাট থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত একটি লাইন তৈরী করতে চান, যা ভাগীরথীর উপর দিয়ে নলহাটি স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত(হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত আজিমগঞ্জ নলহাটি রেললাইনই ছিল জেলার একমাত্র রেললাইন। ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের রানাঘাট - ভগবানগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল শু(হয় ১৯০৫ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে। ঐ বছরের ১০ ই নভেম্বর রেল চলাচল সম্প্রসারিত হয় কৃষ(পুর পর্যন্ত। ১৯০৭ সালের ১৫ ই জুলাই থেকে রেল চলতে শু(করে লালগোলা ঘাট পর্যন্ত। রানাঘাট -লালগোলা শাখায় ৭১.২ কিমি (৪৪.৫ মাইল) রেলপথ রয়েছে জেলার মধ্যে। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই লাইনে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্টেশন ছিল ১৩টি। অবশ্য তখন জিয়াগঞ্জ ও ভগবানগোলা স্টেশনের মধ্যে একটি নতুন স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছিল। ১৯৭৯ সালের জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যানুযায়ী তখন জেলার চৌহদ্দিতে এই লাইনে ছিল ১৪ টি স্টেশন। পরে নদীয়া জেলার পলাশী এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরের মধ্যে সিরাজনগর হল্ট এবং সারগাছি ও বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের মধ্যে নিউ বলরামপুর হল্ট নামে নতুন দুটি স্টেশন তৈরী হওয়ায় বর্তমানে এই লাইনে জেলার চৌহদ্দিতে স্টেশনের সংখ্যা হয়েছে ১৬ । দ(ণদিক থেকে স্টেশনগুলোর নাম হল - সিরাজনগর হল্ট, রেজিনগর, বেলডাঙ্গা, ভাবতা, সারগাছি, নিউ বলরামপুর হল্ট, বহরমপুর কোর্ট, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, নসিপুর রোড, জিয়াগঞ্জ, সুবর্ণমৃগী হল্ট, ভগবানগোলা, পীরতলা হল্ট, কৃষ(পুর এবং লালগোলা। জেলার অর্থনীতির (ত্রে এই লাইনটির গু(ত্ব অপরিসীম কেননা এই রেলপথটিই কলকাতার সঙ্গে জেলাকে সংযুক্ত(করেছে।

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পন্ডিতের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯২০ সালে লালগোলা থেকে কলকাতা অভিমুখী তিনটে ট্রেন পাওয়া যেত। সেগুলি লালগোলা ছাড়ত সকাল ৭টা ২৭ মিনিটে, বিকেল ৩টে ৩৮ মিনিটে এবং রাত্রি ১১টা ২৭ মিনিটে।

এখন অবশ্য জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ট্রেনের সংখ্যাও। এখন সারা দিনে লালগোলা থেকে ৯টি ট্রেন ছাড়ে এবং সমসংখ্যক ট্রেন লালগোলায় এসে থাকে। এদের মধ্যে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন (ভাগীরথী)। শতবর্ষ অতিত্র(ম করতে চলা লাইনটি বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ২০০০ সালের বিধ্বংসী বন্যায় এই লাইনের রেল চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ বছরের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে এই লাইনে রেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ই অক্টোবর থেকে আপৎকালীন ভিত্তিতে ভাগীরথী একস্প্রেস চালান হয় শিয়ালদহ-ব্যান্ডেল-রামপুরহাট হয়ে খাগড়াঘাট পর্যন্ত। ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ট্রেনটি প্রথমে ভাগীরথী একস্প্রেস নামে চালান হলেও পরবর্তীকালে ট্রেনটি চলেছিল শিয়ালদহ-খাগড়াঘাট স্পেশাল প্যাসেঞ্জার নামে। ২৯শে নভেম্বর থেকে লালগোলা ও বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের মধ্যে দুটি ট্রেন চালু হয়।[২৫]

শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনে ডাবল লাইন রয়েছে শিয়ালদহ থেকে কালীনারায়ণপুর জংশন পর্যন্ত এবং বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে কৃষ(নগর পর্যন্ত। ২০০০ সালের ১৩ই নভেম্বর তৎকালীন রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় কৃষ(নগর-লালগোলা শাখা বৈদ্যুতিকরণের কাজের শিলান্যাস করেন। একই দিনে কালীনারায়ণপুর থেকে কৃষ(নগর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজের শিলান্যাসও করেন তিনি। কৃষ(নগর লালগোলা অংশের বৈদ্যুতিকরণের জন্য সেবার রেল বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৭২ কোটি টাকা। সম্প্রতি বহরমপুর কোর্ট,

মুর্শিদাবাদ এবং লালগোলা স্টেশনে কমপিউটার চালিত আসন সংর(ণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে দিয়ে গেছে এমন দীর্ঘতম লাইনটি হচ্ছে বাড়হাড়োয়া-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া (B.A.K.) লাইনের জেলার অংশটুকু। এই লাইনের ১৩৭ কিমি পথ রয়েছে জেলার মধ্যে। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এই লাইনটির ধুলিয়ান গঙ্গা থেকে বাড়হাড়োয়া পর্যন্ত ট্রেন চালু হয় ১৯১১ সালের ১৯ শে জানুয়ারী। কাটোয়া থেকে জঙ্গীপুর রোড পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শু(হয় ১৯১৩ সালে ১ লা মে থেকে। ধুলিয়ান গঙ্গা থেকে জঙ্গীপুর রোড অবধি রেল চলতে শু(করে ১৯১৩ সালে ৩১ শে জানুয়ারী থেকেই। ১৯৭৯ সালের মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, তখন এই লাইনে জেলার সীমানার মধ্যে ২৫ টি স্টেশন ছিল। বর্তমানে এই লাইনে জেলার সীমানার মধ্যে স্টেশন আছে ৩২ টি। এগুলো হল- সালার, মালিহাটি, তালিবপুর রোড, টেঁয়া, মিএ(াগ্রাম হল্ট, বাজারসৌ, কাজীপাড়া হল্ট, চৌরীগাছা, কাঁঠালিয়া রোড, কর্ণসুবর্ণ, জীবন্তী হল্ট, খাগড়াঘাট রোড, নিয়ালিশপাড়া, লালবাগ কোর্ট রোড, ডাহাপাড়া ধাম, আজিমগঞ্জ জংশন, আজিমগঞ্জ সিটি, পোড়াডাঙ্গা হল্ট, মহীপাল রোড, মহীপাল হল্ট, নোয়াপাড়া মহিষাসুর, মণিগ্রাম, গণকর, জঙ্গীপুর রোড, আহিরণ হল্ট, সুজনিপাড়া, নিমতিতা, বাসুদেবপুর হল্ট, হাঁসনগর হল্ট, ধুলিয়ান গঙ্গা, সাঁকোপাড়া হল্ট, বল্লালপুর হল্ট ও তিলডাঙ্গা।

এই লাইনটিই জেলার সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ রেললাইন। চারটে একস্প্রেস ট্রেনসহ মোট ১৫ জোড়া ট্রেন এই লাইন দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে। তিস্তা, তোর্সা, কামরূপ, হাটেবাজারে একস্প্রেসের সঙ্গে এই লাইনে নবতম সংযোজন মালদা হাওড়া জনশতাব্দী একস্প্রেস। ট্রেনটি যাত্রা শু(করে ২০০২ সালের ১লা জুলাই থেকে। প্রথমে ট্রেনটি তার গোটা যাত্রাপথে মাত্র তিনটে স্টেশনে দাঁড়াত। এগুলো হ'ল ফরাক্কা, জঙ্গীপুর এবং খাগড়াঘাট রোড। ২০০২ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ব্যান্ডেল এবং ঐ বছরের ৪ঠা নভেম্বর থেকে নবদ্বীপে ও কাটোয়ায় জনশতাব্দীর স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ২০৬৫ আপ এবং ২০৬৬ ডাউন হাওড়া মালদা টাউন জনশতাব্দী একস্প্রেস ট্রেনের জন্য ক্যাটারিং সার্ভিস বাধ্যতামূলক ছিল। ২০০৩-০৪ আর্থিক বর্ষে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু ভাড়ার কাঠামো যুক্তি(সম্মত হওয়ায় শতাব্দী এবং জনশতাব্দী একস্প্রেসে কোন কোন (ে ত্রে ভাড়া কমেছে। ২০০৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বাধ্যতামূলক ক্যাটারিং সার্ভিস তুলে দেওয়ায় জনশতাব্দী একস্প্রেসের ভাড়া অনেকটাই কমেছে।

সারণী - ১০.৭
ব্লক ভিত্তিক খেয়া ঘাট

ব্লকের নাম	খেয়া ঘাটের সংখ্যা	কোন কোন নদীর পাড়ে অবস্থিত	নৌকার সংখ্যা	
			দেশী	যন্ত্রচালিত
কান্দী	৩	ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, কানা ময়ূরা(ী	৭	২
ভরতপুর - ১	১৪	বাবলা, কুয়ে, ময়ূরা(ী	১২	২
ভরতপুর - ২	৪	বাবলা	১০	২৬
খড়গ্রাম	৫	দ্বারকা, কানা ময়ূরা(ী	৬	২
রঘুনাথগঞ্জ -১	৫	ভাগীরথী	৯১	৩৯
রঘুনাথগঞ্জ- ২	৫	ভাগীরথী	৩০	৬
সাগরদীঘি	৯	ভাগীরথী	-	২৬
সুতি- ১	১১	পাগলা, ফল্গু, ফিডার ক্যানেল	২২	৭
রাণীনগর - ১	৯	ভৈরব	১৬	-
লালগোলা	৭	ভাগীরথী	১৪	৯
হরিহরপাড়া	৫	ভান্ডারদহ বিল	-	১০

সূত্র ঃ সং(-ষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য

মুর্শিদাবাদ জেলার রেলওয়ে মানচিত্রে সর্বশেষ সংযোজন পূর্ব রেলওয়ের বাড়হাড়োয়া-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া লাইনের তিলডাঙ্গা থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত ৮.৬৯ কিমি রেলপথ। এই পথে প্রথম রেল চলে ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর। দৈর্ঘ্য কম হলে কি হবে এই রেলপথ টুকুর গু(ত্ব কিন্তু অসীম। অবিভক্ত(ভারতে (বঙ্গেও) রেলপথে আব্দুলপুর ও আমানুরা জংশন হয়ে মালদায় তথা উত্তরবঙ্গে যাওয়া যেত। দেশ বিভাগের পর উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিহারের সকরিগলিঘাট বা ধুলিয়ানে গঙ্গা পার হয়ে মনিহারিঘাট বা খেজুরিয়াঘাট হয়ে কাটিহার, মালদহ যাওয়া যেত কিন্তু এ পথ ছিল ঘুরপথ, সময় লাগত খুবই বেশী। সমস্যা সমাধানের জন্য এদিকে তিলডাঙ্গা থেকে ফরাক্কা ওপারে মালদা থেকে খেজুরিয়াঘাট পর্যন্ত রেললাইন পেতে ফরাক্কায় গঙ্গা পেরোনোর জন্য চালু হল ওয়াগন ফেরী। পরে ফরাক্কায় ২.২৪ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রেল পুল তৈরী হওয়ায় সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়েছে। এখন সরাসরি রেলপথে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে ভারতের অবশিষ্টাংশের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই লাইনে তিলডাঙ্গা ও ফরাক্কার মাঝে একমাত্র স্টেশনটি হচ্ছে নিউ ফরাক্কা। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এই ৮.৬৯ কিমি রেলপথটুকুর গু(ত্ব যে অসীম সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

এক সময় নদীয়া জেলা বোর্ড নদীয়ার কৃষ(নগর থেকে মেহেরপুর হয়ে (বর্তমান বাংলাদেশ) মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী পর্যন্ত একটি ন্যারো গেজের (২ফুট ৬ইঞ্চি) রেললাইন বসানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের তরফে প্রয়োজনীয় সমী(াও হয়েছিল। ১৯১১-১২ সালে মেসার্স এইচ. ভি. লো অ্যান্ড কোং-কে প্রস্তাবিত এই লাইন তৈরীর দায়িত্বও দেওয়া হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

ডাক যোগাযোগ

মুর্শিদাবাদ জেলায় আধুনিক ডাকব্যবস্থার সূচনা হয় ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে। ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ শহরে ডাকঘর স্থাপিত হয়। সেই সময় বহরমপুর শহরেও ডাকঘর ছিল। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে পাটনা পর্যন্ত ডাক চলাচল করত। ১৭৭৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেস্টিংস ডাক ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ডাক চলাচলের উন্নয়নের জন্য তিনি সমগ্র ভারত কে চারটি ডাক অঞ্চলে ভাগ করেন। এই ব্যবস্থার হাত ধরে মুর্শিদাবাদের ডাকব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়।

তখন বিভিন্ন পর্যায়ে ডাক পরিবহন হ'ত। ডাক চলাচলের জন্য বিভিন্ন স্থানে চটি থাকত। সেখানে ডাক হাতবদল হ'ত। ডাক হরকরার সাথে থাকত মশালচি ও বাদক। মশালচি পথ দেখাত আর বাদক বাজনা বাজিয়ে বন্য জন্তুদের তাড়াত। ডাক চলাচলের প্রতিটি পর্যায়ে থাকত মুন্সি আর ঘড়িওয়ালা। মুন্সি ডাক চলাচলের কাজটি তত্ত্বাবধান করতেন। আর ঘড়িওয়ালা রাখত সময়ের হিসাব। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে মোট ১৫টি পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ থেকে ডাক কলকাতায় পৌঁছাত। হেস্টিংসের সময়ে কলকাতায় থাকতেন পোস্টমাস্টার জেনারেল আর এই জেলার ডাকব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল।

মুর্শিদাবাদ নগরের অবনগরায়ণের সাথে সাথে সেখানকার মুখ্য ডাকঘরটির গু(ত্ব কমতে থাকে। একই সঙ্গে বহরমপুর শহরের উত্থানের সাথে সাথে সেখানে ডাকঘরের মুখ্য কার্যালয়ের অভাব অনুভূত হতে থাকে। ১৮৩০ সালে পোস্টমাস্টার, জেনারেল স্থির করেন যে, মুর্শিদাবাদ শহরের মুখ্য ডাকঘরটি বহরমপুর শহরে স্থানান্তরিত করা হবে। জেলার তৎকালীন কালেক্টর এইচ. টি. ট্রাভারস মুর্শিদাবাদের ডেপুটি পোস্টমাস্টারকে মুখ্য ডাকঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ও নথিপত্রসমূহ বহরমপুরের ডেপুটি পোস্টমাস্টারকে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক মুর্শিদাবাদের ডেপুটি পোস্টমাস্টার ডব্লিউ. পারভিস মুর্শিদাবাদ নগরীর মুখ্য-ডাকঘরের যাবতীয় নথিপত্র ও আসবাবপত্র সমূহ বহরমপুরে পাঠিয়ে দেন। ১৮৩০ সাল থেকেই বহরমপুর মুর্শিদাবাদ পোস্টাল ডিভিশনের প্রধান কার্যালয় হিসাবে কাজ শু(করে এবং এখনও করে চলেছে।

ডাকবিভাগের বহরমপুরের মুখ্য কার্যালয় ভবনটি ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ডাকঘর ভবন। ১৮২৭ সাল থেকে এখানে ডাকবিভাগের কাজকর্ম হয়ে আসছে। কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাই -এর ডাকবিভাগের মুখ্য কার্যালয় ভবনগুলি বহরমপুরের মুখ্য কার্যালয় ভবনের চেয়ে অনেক কম বয়সী। কলকাতা জি.পি.ও.-র বর্তমান ভবনে কাজ শু(হয় ১৮৬৮ সালে। চেন্নাই ও মুম্বাই -এর বর্তমান জি.পি.ও. ভবনে কাজ শু(হয় যথাত্র(মে ১৮৮৫ ও ১৯১০ সালে। সেদিক থেকে দেখলে বহরমপুরের মুখ্য কার্যালয় ভবনের ঐতিহ্য অনস্বীকার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শু(র দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় একটি চিঠি যেতে সময় লাগত মোটামুটি চারদিন। প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা যায় ১৮২৭সালে রাজস্ব বোর্ডের সচিবের একটি চিঠি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ডাকে দেওয়া হয়েছিল ২৭শে মার্চ। এই চিঠি মুর্শিদাবাদে পৌঁছায় ৩১শে মার্চ। তবে কখনও কখনও যে চিঠি পৌঁছাতে দেরি হত না তা কিন্তু নয়। ১৮২৭ সালের ২৩শে এপ্রিল কলকাতায় পোস্ট করা এরকম-ই একটি চিঠি মুর্শিদাবাদ পৌঁছায় ১৮২৭ সালের ৪ঠা মে। এই অস্বাভাবিক দেরীর জন্য তৎকালীন কালেক্টর উর্ধতন কর্তৃপ(র কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তেরও প্রমাণ রয়েছে নথিপত্রে।

সারণী - ১০.৮
জেলায় ডাকঘর বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

বৎসর	মুখ্য-ডাকঘর	উপ-ডাকঘর	শাখা-ডাকঘর
১৯৪৭	১	২১	৭২
১৯৫৭	১	৩০	১৫৭
১৯৬৭	১	৩৫	৩৫০
১৯৭৭	১	৫৭	৪০৯
১৯৮৩	১	১০৩	৪০৭
২০০১	৩	১০৮	৪৪৯

সূত্র ঃ সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পোস্ট অফিসেস্, মুর্শিদাবাদ,
লোকায়ত মুর্শিদাবাদ, পুলকেন্দু সিংহ।

সারণী -১০.৯
বিভিন্ন মুখ্য-ডাকঘরের অধীনস্থ ডাকঘরের সংখ্যা(২০০১)

ডাকঘরের প্রকৃতি	বহরমপুর	কান্দী	রঘুনাথগঞ্জ
মুখ্য-ডাকঘর	১	১	১
বিভাগীয় উপ-ডাকঘর	৩২	১৫	২৫
বিভাগ বহির্ভূত উপ-ডাকঘর	১৪	১০	১২
বিভাগ বহির্ভূত শাখা-ডাকঘর	১৯০	১১০	১৪৯
মোট	**২৩৭**	**১৩৬**	**১৮৭**

সূত্র ঃ সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পোস্টঅফিসেস্, মুর্শিদাবাদ

সারণী - ১০.১০
জেলায় ডেলিভারি ও নন্ ডেলিভারি ডাকঘরের সংখ্যা (২০০১)

ডাকঘরের প্রকৃতি	ডেলিভারি	নন্ ডেলিভারি
মুখ্য-ডাকঘর	৩	০
বিভাগীয় উপ-ডাকঘর	৫০	২২
বিভাগ বহির্ভূত উপ-ডাকঘর	৩২	৪
বিভাগ বহির্ভূত শাখা-ডাকঘর	৪৪১	৮
মোট	**৫২৬**	**৩৪**

সূত্র ঃ সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পোস্টঅফিসেস্, মুর্শিদাবাদ

১৮৮৩ সালে এই জেলায় মোট ৩৮টি ডাকঘর ছিল। এগুলি ছিল আখেরীগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ, বহরমপুর, বদ্রীহাট, বনওয়ারীবাদ, ভরতপুর, ভগবানগোলা, বড়এ(া, বেলডাঙা, কাশিমবাজার, ডাহাপাড়া, দৌলতাবাদ, ডোমকল, ধুলিয়ান, দাদপুর, গোকর্ণ, গোয়াস, হরিহরপাড়া, হাজারপুর, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর, খাগড়া, খামরা, খড়গ্রাম, কল্যাণগঞ্জ, কান্দী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, মীর্জাপুর, নসীপুর, পাঁচথুপি, পাটিকাবাড়ি, রঘুনাথগঞ্জ, সুতি, শক্তি(পুর, সাগরদীঘি ও তালিবপুর -এ।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় এই জেলায় প্রধান ডাকঘর ছিল একটি। উপ-ডাকঘর ছিল ২১টি এবং শাখা-ডাকঘর ছিল ৭২টি। ১৯৮৩ সালে প্রধান, উপ ও শাখা ডাকঘরের সংখ্যা ছিল যথাত্র(মে ১, ১০৩ ও ৪০৭ টি।

বহরমপুরের মুখ্য-ডাকঘর থেকে ডাকবিভাগের স্বাভাবিক কার্যত্র(মের পাশাপাশি পাওয়া যায় স্পীড-পোস্ট পরিষেবা। এখানে রয়েছে ফিলাটেলিক কাউন্টার। সম্প্রতি চালু হয়েছে দুটি কমপিউটার চালিত বহুমুখী কাউন্টারও। ডাকটিকিট প্রেমীরা এখন থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তাদের পছন্দসই ডাকটিকিট। ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের জন্য আরো কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই ডাকঘরের পরিষেবার মধ্যে।

টেলি যোগাযোগ

মুর্শিদাবাদ জেলার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরানো তথ্য অপ্রতুল। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, তখন জেলায় মোট ১২টি টেলিফোন একস্চেঞ্জ ছিল। এগুলি ছিল ঔরঙ্গাবাদ, আজিমগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, ধুলিয়ান, ফরাক্কা, জঙ্গীপুর, কান্দী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ ও রঘুনাথগঞ্জে। এর বাইরে জেলার ২৯৬টি ডাকঘরের মধ্যে ২৪টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা ছিল। এই তথ্য থেকে পরিস্কার যে ২৫ বছর আগেও জেলার ২৬টি ব্লকের অনেকগুলিতেই টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় নি। সম্প্রতি এই চিত্রটা আমূল বদলে গেছে। বিগত কয়েক বছরে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে গেছে। বিগত ৩১শে মার্চ, ২০০৩ -এর হিসাব অনুযায়ী জেলায় ১৯১৮ টি বসতি-গ্রামের মধ্যে ১৮২০ টি গ্রাম টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই সংখ্যাটি ছিল ৮৯২। এই থেকে বোঝা যায় যোগাযোগের এই (ে ত্রটিতে কি বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। ২০০১ সালে জেলাতে টেলিফোন ঘনত্ব ছিল ০.৯২। ২০০৩ সালে এই ঘনত্ব এসে দাঁড়িয়েছে ১.৩১ -এ।

বর্তমানে সমগ্র জেলা বহরমপুর টেলিকম জেলার আওতাভুক্ত(।

টেলিযোগাযোগ দপ্তরের ভাষায় একে বলা হয় 'এল.ডি.সি.এ.' বা লং ডিসট্যান্স চার্জিং এরিয়া। বহরমপুর টেলিকম জেলা এই 'এল.ডি.সি.এ.' টি আবার পাঁচটি 'এস.ডি.সি.এ.' বা শর্ট ডিসট্যান্স চার্জিং এরিয়ায় বিভক্ত। এগুলি হল বহরমপুর, কান্দী, ইসলামপুর, জিয়াগঞ্জ, ধুলিয়ান। এই 'এস.ডি.সি.এ.' গুলির আওতায় রয়েছে জেলার ৯৩টি গ্রামীণ ও শহুরে একস্‌চেঞ্জ। বহরমপুর টেলিকম জেলা পাঁচটি একস্‌চেঞ্জকে 'অন ডিমান্ড' একস্‌চেঞ্জ হিসাবে গড়ে তুলেছে। এগুলো হ'ল রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, জিয়াগঞ্জ, ফরাক্কা এবং জঙ্গীপুর।

২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ছিল ৪৬,১৮১। ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ৭৬,৮৮০ টি। জুনের শেষে এই সংখ্যাটি এসে দাঁড়িয়েছে ৭৯,৯৫১ তে। জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবাও চালু আছে। এই জেলা ইন্টারনেট পরিষেবার আওতায় আসে ২৭ শে জুলাই, ২০০০। মার্চ, ২০০৩ -এর হিসাব জেলায় মোট ৬৮৩টি ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। ইন্টারনেট-ধাবা রয়েছে ২২টি। বর্তমানে জেলার ২৬টি ব্লকের মধ্যে ১৪টি ব্লকে ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। খুব সম্প্রতি জেলায় চালু হয়েছে মোবাইল ফোন পরিষেবা। ২৪শে অক্টোবর, ২০০২ থেকে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। ৩১শে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত জেলায় মোবাইল ফোনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে ৩৮৪১টি। তবে বর্তমানে জেলার সর্বত্র মোবাইল ফোন পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। বহরমপুর শহর, রেললাইন এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে সামান্য কিছু জায়াগায় এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি রিলায়ন্স ইন্ডিয়া মোবাইল নামে একটি বেসরকারি সংস্থা বহরমপুরে মোবাইল ফোনের সংযোগ দেওয়া শুরু করেছে। তবে এখনও এরা এদের পরিকাঠামোর কাজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনি।

সারণী- ১০.১১

জেলায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি

আর্থিক বৎসর (৩১ শে মার্চপর্যন্ত)

বিষয়	২০০০-০১	২০০২-০৩
একস্‌চেঞ্জের সংখ্যা	৮২	৯৩
সর্বমোট টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা	৪৬১৮১	৭৬৮৮০
টেলিফোন ঘনত্ব	.৯২	১.৩১
বৃদ্ধির হার	২০.৬০	৩.৭৩
ভিপিটি আছে এমন গ্রামেরসংখ্যা	৮৯২	১৮২০
পি সি ও র সংখ্যা		
ক) স্থানীয়	-	১৬১
খ) এস টি ডি	৫৯৪	১৩৯১
গ) হাইওয়ে	২৬	২৬
ইন্টারনেট		
ক) সংযোগ সংখ্যা	২১৫	৬৮৩
খ) ধাবার সংখ্যা	৫	২২
গ) ইন্টারনেটের সুবিধাযুক্ত ব্লকের সংখ্যা	-	১৪
মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা	-	৩৮৪১
ডব্লু এল এল সংখ্যা		
ক) শহরাঞ্চল	-	১১২
খ) গ্রামাঞ্চল	-	১৪৮০
টেলিফোন একস্‌চেঞ্জ		
ক) শহরাঞ্চল	১১	১৪
খ) গ্রামাঞ্চল	৭১	৭৯
গ) মোট	৮২	৯৩

সূত্র ঃ জেনারেল ম্যানেজার, মুর্শিদাবাদ টেলিকম ডিস্ট্রিক্ট

তথ্যসূত্র ঃ

১। বিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, বহরমপুর অঞ্চলে ভাগীরথীর গতি-প্রকৃতি 'গণকণ্ঠ' বিশেষ সংখ্যা-১৯৯৮ পৃঃ খ-২২

২। সুধীর রঞ্জন দাস, কর্ণসুবর্ণ মহানগরী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ১৬৫

৩। সুধীর রঞ্জন দাস, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ১৬৪

৪। সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ৮

৫। সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ৩২

৬। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী,বন্দর কাশিমবাজার, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪৮

৭। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ১০

৮। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ৪৮

৯। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ৫২

১০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ৬১৬

১১। ডব্লু,ডব্লু, হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, নবম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৭৬, পৃঃ ২৩

১২। যদুনাথ সরকার, ওল্ড মুর্শিদাবাদ, কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর, পৃঃ ১৩১

১৩। এল. এস. এস. ওম্যালী, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯১৪, পৃঃ ১৫।

১৪। এল. এস. এস. ওম্যালী, পূর্বোক্ত(, পৃঃ ১৬

১৫। বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ,জুলাই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪,পৃঃ ২৬

১৬। খাঁন মহম্মদ মহসীন, এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিসান, মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-১৭৯৩, দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ, ১৯৭৩

১৭। তারাপদ সাঁতরা, মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক প্রাচীন পথঘাট, মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৬।

১৮। ডব্লু,ডব্লু, হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল (নবম খন্ড) পৃঃ ১৪১।

১৯। এল. এস. এস. ওম্যালী, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯১৪, পৃঃ ১৮০।

২০। এ. জে. কিং, কম্প্রিহেনসিভ রিপোর্ট ইন রোড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন বেঙ্গল, ভলিউম- ১, কলকাতা, ১৯৩৮, অ্যাপেনডিক্স- ১, ভলিউম -৩ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার মুর্শিদাবাদ ১৯৭৯, পৃঃ ১৯৩।

২১। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ ১৯৭৯, পৃঃ ১৯৪।

২২। টোয়েন্টি ইয়ার রোড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (১৯৮১-২০০০) ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল , পার্ট - ১, পাবলিক ওয়ার্কস (রোডস) ডাইরেকটরেট, ১৯৮১।

২৩। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ ১৯৯৯-২০০০, ২০০১ ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২৪। রাধারমন মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮০, চতুর্থ মুদ্রন, ১৯৯৭

২৫। প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদের পথ ও পরিবহণের সেকাল একাল, আকাশ প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০০৩